# পঞ্চম অধ্যায়
# অন্ধকার গলিপথের মানুষ : নিয়তির হাতের পুতুল

''এ যুগে কোথাও কোনো আলো—কোনো কান্তিময় আলো
চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের; নেইতো নিঃসৃত অন্ধকার
রাত্রির মায়ের মতো : মানুষের বিহ্বল দেহের
সবদোষ প্রক্ষালিত ক'রে দেয়—মানুষের বিহ্বল আত্মাকে
লোকসমাগমহীন একান্তের অন্ধকারে অন্তঃশীল ক'রে
তাকে আর শুধায় না অতীতের শুধানো প্রশ্নের
উত্তর চায় না আর—শুধু শব্দহীন মৃত্যুহীন
অন্ধকারে ঘিরে রাখে...''[১]

'অদ্ভুত আঁধারে' দাঁড়িয়ে কবি এভাবেই মহাকালের পথে ধাবমান যাত্রীকের অন্ধকারময় পথ দেখতে পেয়েছিলেন। প্রেক্ষিত ভিন্ন হলেও এই অন্ধকার গলিপথের জীবনকেই সমকালের ক্ষেত্র থেকে তুলে এনেছিলেন জগদীশ গুপ্ত। কুষ্ঠিয়ার 'অন্ধকারাছন্ন' গ্রামীণ জীবন পরিবেশ আর আদালতের কর্মসূত্রে এবং সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে নানা টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত লেখকের চারপাশের জগতে সেদিন ঢের কম আলো ছিল। উপরন্তু কলকাতার রাজপথের আলোকময় জীবন থেকে বহুদূরে বসে সমাজ মানুষের অন্ধকার-জীবনকে অবলোকন করেছেন পুরু চশমার কাচ দিয়ে। আর এই অন্ধকার জগৎ তাঁকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। এবিষয়ে তিনি তাঁর সুহৃদ নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে একবার একটি পোস্টকার্ডে কয়েক লাইনের কবিতায় লিখেওছিলেন—

''দুঃখ কষ্ট এ জীবনে চিরস্থায়ী নয়,
আজ হ'ক, কাল হ'ক, হবে তার ক্ষয়।
তবু সেই ভাগ্যবান, যার যথাকালে,
দুঃখ অন্তে সুখোদয় সম্ভবে কপালে।
আমি নয় সেই দলে তাতে নাই ক্ষতি
অশ্রুর কমলে পুজি দুঃখ-সরস্বতী।''[২]

এহেন মানুষটি অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে, অশ্রুর পদ্ম দিয়ে দুঃখ সরস্বতীর পূজার কথা লিখেছিলেন—তাতে যেন সচেতন ভাবেই নিজের বৈষয়িক ব্যর্থতা, দারিদ্র্য এবং সাহিত্য জগতে অপ্রতিষ্ঠার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। ফলে 'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৯২৯) থেকে 'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৯৬০)—উপন্যাসের ধারায় তিনি সচেতনভাবেই বারবার অন্ধকার গলিপথে হেঁটেছেন এবং নিয়তি লাঞ্ছিত মানুষগুলোকে তাঁর সাহিত্যে তুলে এনেছিলেন। সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতো যে সন্ধ্যা আসে সেই অন্ধকারে পথচলা মানুষগুলোর অন্তরেও আলো ফেলে তিনি তাদের অন্তরস্থ অন্ধকারকে ভাষারূপ দিয়েছেন। ফলে একদিকে তিমিরাচ্ছন্ন সমাজ মানুষ এবং অন্যদিকে নিয়তি তাড়িত অসহায় মানুষগুলো তাঁর উপন্যাসে ভিড় করেছে বারবার।

আধুনিক মানুষের নির্বেদ নিঃসঙ্গতার অন্তহীন যন্ত্রণার ছবি ধরা পড়েছে তাঁর সাহিত্যে। এই নিঃসঙ্গতাকে তিনি রোমান্টিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন করেননি। এদিক থেকে তাঁর সাহিত্য একান্তভাবেই দেশজ মৃত্তিকা থেকে উঠে এসেছে। 'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ' নিবন্ধে অধ্যাপক অনিলবরণ রায় প্রথম দেখিয়েছেন জগদীশবাবুর সাহিত্যের অন্ধকারময় মানবসত্তার প্রকাশকে। তিনি লিখেছেন—

''তিনি (জগদীশ গুপ্ত) দেখিতেছেন, ভগবান, ধর্ম, নৈতিকতা এসবই মিথ্যা, শুধু তাহাই নহে, এ সংসারের যে বিধাতা সে এক নির্মম ক্রুর হৃদয় শয়তান। তিনি সবত্রই শুধু দেখিতেছেন শয়তানী এবং তাঁহার এই অনুভূতি তাঁহার মধ্যে যে রসের সৃষ্টি করিতেছে তাহারই ভিয়ান করিয়া তিনি তাঁহার ছোটগল্পগুলিকে রচনা করিতেছেন।''[৩]

এই ব্যাখ্যা তাঁর উপন্যাসগুলি সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। অন্ধকার গলিপথ, কদর্য মানুষ, ক্রুর শয়তান ভগবান আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অসহায় মানুষগুলির নিয়ন্ত্রক তাদের অদৃষ্ট বা নিয়তি। এই নিয়তি তাড়িত মানুষগুলির স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি (Freedom of will) বলে কিছুই নেই। তারা সকলেই নিয়তির হাতের পুতুলমাত্র। এই নিয়তি নির্ভর পুতুলগুলো সম্পর্কে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের নায়িকা কুসুমের বাবাকে দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সারসত্যটুকু বলিয়েছিলেন। মানুষ আসলে নিয়তির হাতের পুতুলমাত্র। নিয়তি আড়ালে বসে থেকে যেভাবে আমাদের পুতুলনাচের পুতুলের মতো নাচান আমরা সেভাবেই নাচি, সেভাবেই কথা বলি। কারণ ব্যাখ্যা করে উপন্যাসটির শেষে মানিক লিখেছিলেন—

''নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবনের স্রোত বহিতে পারে? মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি, এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে। মাধ্যাকর্ষণের মতো যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়।''[৪] এখানে প্রশ্ন হলো, নিয়তি বা অদৃষ্ট তাহলে কী? এই নিয়তি বা অদৃষ্ট দুর্জ্ঞেয় অনিয়ন্ত্রণীয় এক শক্তি যা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রীসসহ পৃথিবীর প্রায় সারাদেশেই এই নিয়তি একটি প্রাচীন ও অনিবার্য বিশ্বাস। এর সমার্থক শব্দ হিসেবে দৈব, ভাগ্য, কাল, বিধি, বিধিলিপি, বিধান, ললাট লিখন ইত্যাদির ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে সুনির্দিষ্ট করে এর সংজ্ঞা দেওয়া খুব মুশকিল। সারা পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে একটা পরিসরে এই নিয়তি নিয়ে মতৈক্য রয়েছে। মানুষ যখন সুখী থাকে, জীবন যখন সহজ আনন্দের তখন নিয়তির কথা বলা হয় না। কিংবা যখন মানুষের জীবনে খুব ভালো সময় আসে তখন বলা হয় তার সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু যখনি সৌভাগ্যের সোপান থেকে মানুষের অনিবার্য অবতরণ ঘটতে থাকে তখনই বলা হয় নিয়তির কথা। এই নিয়তির বিরুদ্ধাচারণ করে কখনোই জীবনে সফল হওয়া যায় না। কারণ নিয়তি অপরিবর্তনীয়, অবোধ্য আর যথেচ্ছাচারী। এর হাত থেকে কারও রেহাই নেই। এমন একটি ভাবনার উপরেই জগদীশবাবুর গল্প উপন্যাসগুলি দাঁড়িয়ে আছে। কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এবিষয়ে লিখেছেন—''...আমি তাঁহার সেই গল্পগুলির কথাই বলিতেছি, যাহাতে মানুষের জীবনে একটা অতিশয় দয়াহীন, দুর্জ্ঞেয় দৈব নির্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে, মনে হয়, জীবনের আলোকোজ্জ্বল নাট্যশালার একপ্রান্তে একটা অন্ধকারময় কোণ আছে, সেখানে একটা নামহীন, আকারহীন হিংস্রতা সর্বক্ষণ ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে—মানুষ তাহারই যেন এক অসহায় শিকার; তাহার নিষ্ঠুরতাও তত ভয়ঙ্কর নয়—যত ভয়ংকর তাহারই সেই অতি-প্রাকৃতরূপ।''[৫]

নিয়তির এই কৃষ্ণপক্ষ বিস্তার এবং তারই কারণে মানুষের অসহায়তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় 'অসাধু সিদ্ধার্থ', 'লঘুগুরু', 'রতি ও বিরতি', 'যথাক্রমে', 'তাতল সৈকতে' প্রভৃতি উপন্যাসে। তবে গ্রীক নিয়তিবাদের সঙ্গে কিংবা এদেশের অদৃষ্টবাদী ভাবনার সঙ্গে জগদীশবাবুর নিয়তি ভাবনায় একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উপন্যাসগুলিতে আলোচনায় যাবার আগে লেখকের দুটি ছোটগল্পে এই নিয়তিবাদের প্রকাশ কীভাবে ঘটেছে তা উল্লেখ করা যায়। গল্প দুটি হল 'দিবসের শেষে' এবং 'হাড়'।

প্রথম গল্পটিতে আমরা দেখি কামদা নদীর তীরবর্তী গ্রামে রতি নাপিতের বাস, তার

একটি মাত্র ছেলে, পাঁচু—বয়েস পাঁচ বছর। সেই পুত্রটিকে নিয়তির ছোবল থেকে রক্ষা করা প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন—''রতির স্ত্রী নারাণী তিনটি পুত্রকে প্রসব গৃহ হইতে নদী গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পাঁচুগোপালের মাদুলি ধারণ করে—তারপর পেটে আসে এই পাঁচু। তাই অসংখ্য মাদুলি-কবচ-তাবিজ প্রভৃতি আধিদৈবিক প্রকরণ পাঁচুর অঙ্গে নিয়ত উদ্যত থাকিয়া যাবতীয় অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রহরা দিতেছে।''[৬] এই বহু আরাধনার ধন পাঁচু একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মাকে বলে, তাকে আজ নাকি কুমীরে নেবে। মা নারাণী চমকে ওঠে ছেলের কথা শুনে। এমন অলক্ষুণে কথা শুনে রতি ছেলেকে শাসন করে। এই মৃত্যুর পূর্বাভাসের কথা জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি সেদিন রতিকে ডেকে বলেছিল—''রতি রকম ভালো নয়, এটা মৃত্যুর লক্ষণ; এরকম মনের ভুল হয় পাগলের কিংবা যার মরণ ঘনিয়েছে।''[৭] কিন্তু এতোকালের পরিচিত কামদা নদীতে কুমীর থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই। গ্রামের কেউ কোনদিন দেখেনি কুমির, কিংবা কোনো জনশ্রুতিও ছিল না। মনের আনন্দে কাঠাল খেয়ে, শরীরে উঠোনে ধুলো লাগলে রতি তাকে নদীতে নিয়ে যায় স্নান করাতে। পাঁচু একটা ঘট নিয়ে বাবার সঙ্গে নদীতে যায় এবং বাবার তত্ত্বাবধানে নিরাপদে স্নান করে। ফেরার সময় সঙ্গে আনিত ঘট নিতে ভুলে যায় পাঁচু। ফিরে গিয়ে একা ঘট আনতে গেলে পাঁচুর সকালের পূর্বাভাসই সত্য হয়ে দাঁড়ায়—

''...এমন সময় তাহারই একান্ত সন্নিকটে দুটি সুবৃহৎ চক্ষু নিঃশব্দে জলের উপর ভাসিয়া উঠিলো; পরমুহূর্তেই সে স্নানের জল আলোড়িত হইয়া উঠিলো, লেজটা একবার চমক দিয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া গেলো—এবং চক্ষের পলক না পড়িতেই পাঁচু জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেলো।''[৮]

দ্বিতীয় গল্পটির নাম 'হাড়'। এই গল্পে সনাতন একদিন সকালে নদীতে মাছ ধরতে যাবার সময় রসি ডাইনীর উপর চড়াও হয়ে তাকে মারতে গেছে। রসি কাঁপতে কাঁপতে সকলের সামনে সনাতনকে অভিশাপ দিয়ে বলেছে— ''অল্পেয়ে আমায় মারতে উঠেছিলি? ভগমান তা দেখেছেন। তুই মাছ মারতে চলেছিস্ ঐ মাছই যেন আজই তোকে মারে।''[৯] ছোট নদীতেই সেদিন কোঁচ নিক্ষেপ করে গাছের মতো প্রকাণ্ড এক চিতল মাছ ধরেছে। প্রবল পুচ্ছ তাড়নায় ডিঙি ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম ক'রে সেই মাছ। কিন্তু সনাতনের সঙ্গে পেরে ওঠে না। পুত্র মথুরকে নিয়ে সনাতন সেই মাছ দিয়ে মহানন্দে খেতে বসেছিল। সহসা সেই

মাছের শিরদাঁড়ার হাড় গলায় বায়ুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করে মাঝপথে আটকে যায়। অ্যাসফিক্সিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে সনাতনের মৃত্যু হয়।

গল্প দুটিতে নিয়তির হাতে মানুষের অসহায়তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র ধরা পড়েছে। নিয়তিবাদী গল্পগুলোর সঙ্গে জগদীশবাবুর গল্পের মৌলিক পার্থক্য হল, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ 'সতর্ক' থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর নিয়তির আক্রমণ নেমে আসে না। কিন্তু যে মুহূর্তেই মানুষ একটু অসতর্ক হয় তখনি নিয়তি ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষের ওপর। পাঁচুর মৃত্যু হয়েছে যখন সে একা নদীতে ঘট আনতে গেছে। একইভাবে বিরাটাকায় মাছের পুচ্ছ তাড়নার সময় সনাতন সতর্ক ছিল, ফলে বিপদ আসতে পারে নি। কিন্তু যখনি সে একটু অন্য মনস্ক হয়েছে তখনি নিয়তি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ এই নিয়তি অন্ধকারে ওৎ পেতে বসে থাকে। সুযোগ বুঝে শিকারের উপর অর্থাৎ মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করে না। কুমীর এখানে সেই নিয়তি। নিয়তি হয়েছে সনাতনের অন্য মনস্কতা প্রসূত মাছের হাড়।

অন্ধকার গলিপথের মানুষের জীবনে নিয়তির অতর্কিত আক্রমণের কথা ব্যক্ত হয়েছে লেখকের উপন্যাসগুলিতেও। 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসে জনৈক প্রতারক সিদ্ধার্থ যেটি তার প্রকৃত নাম নয়—তার প্রকৃত নাম নটবর। সিদ্ধার্থ পরিচয়ের আড়ালে যে নিজের ভবিষ্যৎকে সতর্কভাবে গড়ার দিকে এগিয়েছিল। এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে তার বাহ্যিক সুদর্শন সৌম্যকান্তি চেহারা। এই নকল সিদ্ধার্থ অজয়ের মন জয় করেছে। নিজের ভেতরের অভিনয়টা একদিন বেফাঁস হয়ে বেরিয়ে পড়ে নটবরের। লেখক সেই জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছেন—

''একে একে মনে পড়ে জীবনের কথা—

সে চোর, জারজ; বেশ্যার দাসত্ব সে করিয়াছে। যে-রত্ন আহরণ করিতে সিঁদ কাঠি লইয়া বাহির হইয়াছে তাহার মত কুক্কুটের জন্য সে অপরূপ রত্নের সৃষ্টি হয় নাই। জীবনের আরম্ভ মুদিখানায়—আরো ভালো করিয়া মনে পড়ে, থিয়েটারের কথাটা— ... মেধা ছিল, আগ্রহও ছিল— ... অর্থ লোভে এক বৃদ্ধা বারাঙ্গনার ... দিক্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে সাক্ষাৎ হইয়া গেল সেই আসল সিদ্ধার্থ বসুর সঙ্গে।''[১০]

ছদ্মবেশী নটবর খুব সপ্তর্পণে এগিয়ে গেছে অজয়ার জন্যে। অজয়ার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহের আয়োজন যখন শেষ পর্যায়ে তখন অজয়ার কাছে সিদ্ধার্থের প্রকৃত পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়। কাশীনাথ কোনো কিছুই গোপন না করে অকপটে সিদ্ধার্থের সমস্ত অতীত বলে ফেলেন।

সবাই যাকে সিদ্ধার্থ ভাবছে, সে নটবর, বৈষ্ণবীর গর্ভে ব্রাহ্মণের জারজপুত্র। এই পরিচয় পেয়ে অজয়া আকাশ থেকে পড়ে। সে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে নিলে রজত তাকে ধরে ফেলে। কাশীনাথ নটবরের কাছে সক্রোধে জানতে চান—''তুই কেন এ কাজ করলি? তুই কেন মানুষের সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছিস? বল্ সিদ্ধার্থ কোথায়? তার নাম আর পরিচয় তুই কোথায় পেলি?''[১১]

প্রবঞ্চক নটবর একথার কোনো জবাব দেয় না। নিজেকে নিরপরাধ দাবী করে। নিয়তির চক্রান্তেই সে ভালোবেসে ছিল বলে জানায়। আর ভালোবাসার তাড়নায় আর প্রতিদানের লোভে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার কথা সে স্বীকার করেছে। অজয়ার কথায় রজত নটবরকে বেরিয়ে যেতে দেয়। যাবার সময় জানিয়ে যায় প্রকৃত সিদ্ধার্থ এই পৃথিবীতে বেঁচে নেই। অমোঘ নিয়তির অনিবার্য ধারায় নটবরের জন্ম, তার বেড়ে ওঠা এবং ছদ্মবেশ খসে যাবার মধ্যদিয়ে আসলে তার আত্মিক মৃত্যুও হয়ে গেছে। এখানেও নিয়তি অসতর্ক মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাশীনাথের মধ্যদিয়ে। নটবরের এই ছদ্মবেশ আর ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নিয়তির ভূমিকা উল্লেখ করে অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—''... নিজে যা নয় ছদ্ম আচরণে নিজেকে তাই প্রতিপন্ন করবার প্রাণান্ত প্রয়াস তো প্রত্যেকেরই জীবনের এক অংশ—এই জীবনগত চিরন্তন অদৃষ্ট লিখনের টানে আমাদের অনেক ব্যর্থতার জন্ম। সিদ্ধার্থের ছদ্মবেশের ব্যর্থতা প্রকৃতপক্ষে তার জীবনের ব্যর্থতা।''[১২]

'লঘুগুরু' উপন্যাসে উত্তম গণিকা জীবনের কদর্য পথ ছেড়ে সুস্থ গৃহী জীবনে প্রবেশ করতে চেয়েছিল। তার অন্ধকারময় অতীতের দিকে অবলোকন করলে দেখা যায় তার প্রথম পরিচয় ছিল যূথী রূপে, তারপর বনমালা এবং শেষে উত্তম। নিয়তির নির্মম পরিহাসে মানুষ হয়ে উঠেছিল একদিন যূথীর অন্যতম বড় শত্রু। সেই মানুষের কারণেই উত্তম গৃহী জীবনে সম্মান লাভ করে নি। প্রতিবেশী থেকে শুরু করে স্বামী বিশ্বম্ভর পর্যন্ত তাকে বারবার অপদস্থ করেছে। বহু পুরুষচারিণীর জীবন ছেড়ে উত্তম একক গৃহ-জীবনে এসে স্থিতু হয়েছিল। ততক্ষণ নিয়তি তার ওপর নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি। কিন্তু যখনি বিশ্বম্ভরের গৃহে এসেছে এবং টুকীর মাতৃত্বের ভার নিয়েছে তখনি তার নিয়তি নির্দেশিত পথ স্থির হয়ে গেছে। এই সংসার যাপন ছিল অন্ধকার গলিপথে প্রত্যাশার সূর্যকে খুঁজে ফেরা। কিন্তু এই প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়নি।

■ প্রতিবেশীরা তাকে 'বেশ্যে' বলেছে।

■ বিশ্বম্ভর পূর্ববর্তী স্ত্রীর সঙ্গে তুলনায় উত্তমকে 'বউ' বলে স্বীকার করেনি।

■ বিশ্বম্ভরের বন্ধুরা তাকে 'খাণ্ডারী' বলেছে।

■ হিরণের মৃত্যুর কথা শুনে কাঁদলে বিশ্বম্ভর উত্তমকে বেড়াল শকুনের সঙ্গে তুলনা করেছে।

■ শুচি বায়ুগ্রস্ততায় সে গৃহস্থের ঘরের বউকেও হার মানিয়ে দিতে পারে বলে বিশ্বম্ভর ব্যঙ্গ করেছে—

■ টুকীকে নিয়ে সে পালিয়ে যাবে এবং দেহ ব্যবসায় নামাবে, প্রতিবেশীর এমন আশংকায় বিশ্বম্ভর সীলমোহর দিয়েছে।

■ গণিকার কাছে মানুষ বলেই টুকীর বারবার বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। এর জন্যে উত্তমকে অভিযুক্ত করেছে বিশ্বম্ভর।

■ টুকীর বিয়ে হয়ে গেলে উত্তমের আর দুশ্চিন্তা করা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে নি। এইভাবে শেষ পর্যন্ত টুকীর পাপের পথে নেমে যাওয়ার মধ্যদিয়ে উত্তমের জীবনের ট্রাজেডি তথা নিয়তির কঠিন আঘাত বর্ষিত হয়েছে। নিয়তির এই নিষ্ঠুরতার প্রসঙ্গে সমালোচক ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—''মানুষ তার আত্যন্তিক জীবনতৃষ্ণায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য আমরণ সংগ্রাম করে অথচ নিষ্ঠুর নিয়তি প্রচণ্ড এক দুর্জ্ঞেয় শক্তি নিয়ে মানুষের সেই প্রচেষ্টাকে ফুৎকারে উড়িয়ে নিয়ে যায়।''[১৩]

উপন্যাসে টুকী জন্মের সময়ই মাকে হারায়। উদাসীন পিতা বিশ্বম্ভর তাকে প্রতিবেশীদের জিম্মায় ফেলে রেখেই বারবার বাইরে, ভগ্নিপতি লালমোহনের বাড়ী চলে যেত মাঝে মাঝে। টুকী পরের হাতে মানুষ, পরেই তার নাম দিয়েছে। এহেন নিয়তি লাঞ্ছিত শিশুটির জীবনে উত্তম মাতৃস্নেহ নিয়ে আবির্ভূত হলে টুকীর কষ্ট লাঘব হতে শুরু হয়। মায়ের স্নেহে আদরে ভালোবাসায় শাসনে সে বেড়ে উঠতে থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা-সাংসারিক কাজকর্মে সে নিপুনা হয়ে ওঠে। এরপরই নিষ্ঠুর নিয়তির নিঃশব্দ পদসঞ্চার ঘটেছে। উত্তম নিজে পঙ্কিল জীবনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল তার থেকে সম্পূর্ণ অন্য জগতে টুকীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু নিয়তি এবার সেই সব প্রয়াসকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্রথমেই 'ভালো ঘরে' টুকীর বিয়ের আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে। নির্মম নিয়তির

মতো কুচক্রী প্রতিবেশী পাত্রপক্ষকে বেনামী চিঠি লিখে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে—

''মহাশয়, আপনি যাহার কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন, সে ব্যক্তি একটি রক্ষিতা লইয়া বাস করিতেছে। কন্যাটি তাহার গর্ভজাতা নহে; কিন্তু তাহাকে সেই স্ত্রীলোকটিই মানুষ করিয়াছে। অতএব সাবধান হউন।''[১৪]

এই 'সাবধান বাণী'র ফলস্বরূপ টুকীর বিয়ে ভেঙে গেছে। বারবার চেষ্টা করেও বিশ্বম্ভর মেয়েকে সৎপাত্রস্থ করতে পারেনি। এরজন্য সমস্ত দায় উত্তমের উপর চাপিয়েছে। অসহায় নিরপরাধ টুকীর বিয়ে হয়ে যায় পঞ্চাশোর্ধ রক্ষিতা পরিবৃত পরিতোষের সঙ্গে। নিয়তি এবার টুকীকে নিয়ে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দেয়। স্বামীর অবহেলা নির্যাতন আর সতীন স্বরূপা সুন্দরীর যৌথ ষড়যন্ত্রে টুকীর ভাগ্য চূড়ান্ত হয়েছে এক সন্ধ্যায়। স্বামী পরিতোষের পরিবর্তে বাড়ী আসে অচিন্ত্য—যে টুকীকে ভোগ করার জন্য সুন্দরীর হাতে টাকা গুঁজে দেয়। টুকীর কাছে সমস্তটাই জলের মতো সহজ হয়ে যায়। যৌবন ভিক্ষুর সামনে সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়—

''... আসুন।

অচিন্ত্য চম্‌কিয়া বলিল, কোথায়?

— আমার সঙ্গে।

— সে কি?

টুকী বলিতে লাগিল, এ কাজ যদি করতে হয়, তবে আমি আপনাকে দেব দেহ, আপনি আমাকে দেবেন টাকা। মাঝখানে ওরা কে?''[১৫]

জন্মমুহূর্তে যার জীবনে বিধাতা বিরূপ ছিল আজ আবার সমস্ত বিরূপতার কালো মেঘ নিয়ে টুকীর জীবনে তার নিষ্ঠুর আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেল। অসহায় টুকী সুন্দরীর বাড়ীর চৌকাঠ পার হয়ে বাইরে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। যে যূথী একদিন পাপের পথে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছিল, তারপর বনমালা-উত্তম রূপে সেখানে কদর্য জীবন কাটিয়ে চেষ্টা করেছিল সুস্থ গৃহী জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে—টুকীর অসহায় পরিণতির মধ্যদিয়ে সেই প্রতিষ্ঠার লড়াই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। টুকীর পিতা হিসেবে 'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' বিশ্বম্ভর প্রথমদিকে উচ্ছৃঙ্খল জীবনে ডুবে ছিল, কিন্তু যখন তার মধ্যে পিতৃসত্তার জাগরণ ঘটেছে তখন তাকে কেবল একজন অসহায় পিতার ভূমিকাতেই দেখা যায়। পরিতোষ কিংবা সুন্দরীর কোনো উত্তরণ নেই। এরা অন্ধকার গলিপথের মানুষ।

মানব ভাগ্যকে জগদীশবাবু ধরতে চেয়েছেন তাঁর গল্পে যেমন তেমনি উপন্যাসেও। বিশেষ করে উপন্যাসে। তার সৃষ্ট মানুষগুলির অধিকাংশ নির্মম, নিষ্ঠুর নিয়তির দ্বারা লাঞ্ছিত পীড়িত। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ড. বীরেন্দ্র দত্ত স্পষ্টতই জানিয়েছেন—''...কখনো আশা, কখনো নৈরাশ্য, কখনো মানুষের অক্লান্ত কর্মদক্ষতা, কখনো অসহায় কর্মহীনতা, কখনো জীবনপ্রাণের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা, কখনো অসহায় ইচ্ছাহীন কর্মশূন্যতা মানুষের জীবন-ভাগ্যে বিস্ময় রসের প্রকাশ ঘটায়। ঠিক ঈশ্বর নয়, এক অলৌকিক অস্তিত্বেই মানুষের ভাগ্য তাকে তাড়িত করে। তা তার জীবনের অধীন নয়, তাকে মানুষ জয় করতে পারে না। এ হলো মানুষের জীবনে নিশ্চিত স্থির অভিশাপের মতো।''[১৬]

মানুষের জীবনে এই অভিশাপের কাহিনী 'মহিষী' উপন্যাসটি। পুত্রের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে পিতা অর্থের লোভে কালো মেয়ের সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেয়। পুত্র ষড়যন্ত্রটি পরে জানতে পারে, ফলে নিজ দুর্বলতার প্রতি গ্লানি এবং স্ত্রীর প্রতি তীব্র ঘৃণা জন্মায়। পুরুষকারের অভাবে পিতার বিরুদ্ধে ক্রোধ ব্যক্ত করতে না পেরে পিতার নির্বাচিত পাত্রীর বিরুদ্ধেই তা উগ্‌ড়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। এই বিচ্ছেদের পিছনে নিয়তি যেভাবে নীরবে কাজ করে গেছে, তা অশোক কিংবা জ্যোতিময়ীর সাধ্য ছিল না প্রতিরোধ করার। পিতা ব্রজকিশোরের অর্থলোলুপতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেনি অশোক, এক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত অক্ষমতা ছিল এবং এরজন্য তার বিধাতা তাকে বিপথে চালিত করেছে। জ্যোতির্ময়ী ছিল কালো—এর জন্যে তার নিজের কোনো দোষ বা করণীয় কিছুই ছিল না। শেষপর্যন্ত তাকে নীরবেই স্বামীর গৃহত্যাগ করতে হয়েছে। নব বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে রোমান্স রসধারায় নিমজ্জিত স্বামীর কাছে শেষ মুহূর্তেও অপমানিতা হতে হয়েছে ভাগ্য বিধাতার বিমুখতার জন্যে। উপন্যাসের একেবারে শেষ দৃশ্যে নিয়তি নাটকের পরিচালকের মত নেপথ্যে থেকে সমস্তটা পরিচালনা করেছে। জগদীশবাবু সেই দৃশ্য অংকন করেছে এভাবে—

''দরজার দিকে মুখ করিয়াই অশোক বসিয়াছিল; নন্দ তার অদূরে; স্বামী স্ত্রীতে বোধহয় হাসাহাসি চলিতেছিল। জ্যোতি দরজার সম্মুখে দেখিয়া অশোক হাসিতে হাসিতেই বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিয়া উঠিল, —অই! তুমি আছো এখানেই?

এই নির্মম প্রশ্নে যত বেদনা ছিল, জ্যোতির প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু তাহা নিঃশেষে গ্রহণ করিল। তার চোখের সম্মুখে একটি মুহূর্তের জন্য একটা কালো পর্দা দুলিয়া গেল; ... নন্দ

বলিল, —দিদি এসো আবার।

জ্যোতির জবাব ছিল না, কিংবা অশোকের সেই হাসিটা শেষ মুহূর্তে তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল বলিয়া সে কথার জবাব দিতে পারিল না তাহা জানা নাই।"[১৭]

কালো মেয়ের ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবনের এই কাহিনী একটা সময়কে চিহ্নিত করে যায়, যার ওপর মেয়েটির কোনো 'Freedom of will' বলে কিছু ছিল না।

মানব ভাগ্যের এক জটিল স্তর লেখক পরিস্ফুট করেছেন 'দুলালের দোলা' উপন্যাসে। উপন্যাসটিতে রয়েছে তিনটি পৃথক অংশ যার প্রথমটি পশ্চিম প্রবাসী নীরদবরণের তিক্ত অভিজ্ঞতা আর অন্য দুটি গ্রামস্থ বৃদ্ধ পিরুর মুখ দিয়ে বলা ঘটনার কোলাজ। নীরদবরণ মানুষের জীবনের অন্ধকার গলিপথে প্রবেশ করে যা প্রত্যক্ষ করেছে তাতে সে নিজে সহ মানব ভাগ্যের অসহায়তা কেমন হয়ে থাকে। সেই সূত্রেই এসেছে সতীশের কথা। ভরত গিরিবালার সংসারে কাজের মেয়ে স্বর্ণর গর্ভে জন্ম নেয় সতীশের বাবা। সেই সম্পর্কের ভাবনায় বিক্ষুব্ধ সতীশের মনের অন্ধকার গলিপথে বিচরণের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। তার সম্পর্কে নীরদ জানিয়েছে—''আমার করুণা জন্মিল; মনে হইল, কি নিদারুণ উত্তপ্ত অন্তর্দ্দাহে এই নিরপরাধ ব্যক্তির সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি বিনষ্ট হইয়া গেছে, আর সে বোধ হয় তা জানে। এই গুরুভার আত্মনির্য্যাতন বোধহয় সে সজ্ঞানেই বহন করিতেছে। কেবল অভিশপ্ত সেই ক্লেশই কন্যার প্রতি অশ্রাব্য অকাতর কটুক্তির আকারে উদ্‌গীরিত হইতেছে। পাপের ইচ্ছায় নহে, প্রলোভনে নহে, আত্মকৃত পাপের অনুশোচনায় নহে, একজনের স্খলিত জীবনের পাপের জ্ঞান তাহারই বুকে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে নামাইবার স্থান নাই, তাহাকে হত্যা করিবার উপায় নাই—তার ছট্‌ফটানির অন্ত নাই।"[১৮] এইভাবে ভাগ্য বিড়ম্বিত সতীশ লোকের কথা যেখানেই ফোটে সেখানেই কান পেতে দাঁড়ায়, তার কথা কেউ বলছে কিনা। প্রচলিত সমাজ নীতির বাইরে গর্হিত যৌন সম্পর্কের ফলে তার বাবার জন্ম বলে সেই ভাবনায় তার মন পীড়িত হয়। বিবেকতাড়িত সতীশ অপরাধবোধে পিতামহীকেই দায়ী করে। এক সময়ে অপরাধের সূত্রে নিজের স্ত্রী ও তার অবর্তমানে কন্যাকেও দায়িত্ব দিয়ে দেয়। সতীশ দাসের এই মানসিক যন্ত্রণা এবং তা থেকে মুক্তির উপায়—সবই চরিত্রটির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। জটিল মনোবিকলনকে চিত্ররূপে জীবন্ত করতে গিয়ে লেখক মানব ভাগ্যের জটিলতাকেই সত্য করেছেন।

পল্লী বাংলার পটভূমিকায় রচিত 'যথাক্রমে' উপন্যাসে রয়েছে দুটি কাহিনী—একটি

দীনবন্ধু-সাবিত্রীর কাহিনী এবং অন্যটি নিত্যপদ নামক গ্রাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ একজন যুবকের কাহিনী—যে নিঃস্বার্থভাবে গ্রামে ডাক্তারী করার সংকল্প নিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হাতুড়ে ডাক্তার ফণীবাবুর পথকেই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। চন্দনা নদীর ধারে ছোট্ট গ্রাম বেতডাঙ্গা। সেখানকার মুদি দোকানদার দীনবন্ধুর পিতা রামপ্রসাদ। তার মতো সাধারণ মানুষের ভাবনার মধ্যদিয়ে লেখক জীবন-মৃত্যু-ভাগ্য বিধাতার লেখাকে চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট করেছেন—

''হেমন্তের পর শীত ঋতুটাকে বাদ দিয়া বসন্ত আসিবে ইহা যেমন কেহ আশা করিতে পারে না, তেমনি রামপ্রসাদেরও মনে হইত, আজিকার দুঃখের পর সুখ দেখা দিবে, সংসারের এই নিয়ম চক্রের আবর্ত্তনের হাত হইতে নিস্তার নাই; তবে তার দুঃখও যেমন মৃদু, সুখও তেমনি মৃদু; সুখ-দুঃখের এই মৃদুতাই চিরদিনের পরিচয়ে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু মৃত্যু সংসারে নিয়মের ভিতর হইলেও মৃদু নয়।''[১৯]

অদ্ভুদ এই জীবন পর্যবেক্ষণ, অদ্ভুত এই নিয়তি। বড় ধীর  পায়ে কখন কার দুয়ারে এসে দাঁড়াবে কেউ বলতে পারে না। রামপ্রসাদের জীবনেও একদিন অতি ধীর-মন্থর গতিতে মৃত্যু এসে হানা দেয়। 'মৃদু স্রোতের মাঝে যমদণ্ড পড়িয়া স্রোত বাধা পাইয়া একদিন ফেনাইয়া উঠিল, স্ত্রীর মৃত্যু রামপ্রসাদের অন্তরে কঠিন ঘা দিল।'[২০] চিরদিনের অন্তঃপুর থেকে সহসা যাত্রা করে রামপ্রসাদের স্ত্রী চিরদিনের শ্মশানে চলে যেতেই রামপ্রসাদের গৃহ শূন্য হয়ে যায়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে দীনবন্ধু ও সাবিত্রী ছেলেবেলাতেই মাকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে। রামপ্রসাদ তাদের সান্ত্বনা দেয়। মেয়ে সাবিত্রী যখন প্রতিবেশী বন্ধু হারু-কুতু-অনির মা বেঁচে আছে বলে আক্ষেপ করেছে তখন রামপ্রসাদ বুঝিয়েছে এদের মা বেঁচে থাকলেও খেঁদির মা বেঁচে নেই, ভোলার মা বেঁচে নেই, চাঁপার মা বেঁচে নেই। রামপ্রসাদ সংসার আর ব্যবসা—একা হাতে হাল ধরে। কিন্তু নিয়তি এরপরে আরও বিরূপ হলেন। নিয়তি এবার রামপ্রসাদকেও টেনে নিলেন এবং পাঠিয়ে দিলেন তার স্ত্রী সাবিত্রীর কাছে। বাবাকেও হারিয়ে দীনবন্ধু ও সাবিত্রীর কঠোর জীবন সংগ্রাম শুরু হয়। অন্ধকার গলিপথে এই লড়াই চলেছিল দীর্ঘকাল।

উপন্যাসের দ্বিতীয় কাহিনীতে নিত্যপদ ডাক্তারের বিড়ম্বিত ভাগ্যের সঙ্গে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের শশীভূষণের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রামের মানুষ মেডিক্যাল

কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তারের চেয়ে গ্রাম্য কবিরাজ যাদবকেই বেশী ভরসা করে। ডাক্তার শশী বারবার গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাবার স্বপ্ন দেখে। শহরে চাকরী সুন্দর বাংলো বাড়ি সুন্দরী স্ত্রী—এসব ভাবতে ভাবতেই তার জীবন গাঁওদিয়া গ্রামেই থেমে যায়। প্রতিবেশী হারুঘোষের বাড়ীর অদূরে তাল বনের ধারে টিলার উপর দাঁড়িয়ে যে সূর্যাস্ত দেখত। প্রতিবেশী বন্ধু পরাণের স্ত্রী কুসুমকে ঘিরে স্বপ্ন দেখত। কিন্তু একদিন সবপথ বন্ধ হয়ে যায়। কবিরাজ যাদব মারা যাবার আগে গ্রামে হাসপাতাল করার জন্যে অর্থ রেখে যায় শশীর তত্ত্বাবধানে। আর শশীর পিতা গোপাল শেষ বয়সের অবৈধ সন্তান নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায় রাতের অন্ধকারে। কুসুম প্রেমে সাড়া না পেয়ে চিরদিনের জন্য গাঁওদিয়া ছেড়ে গেছে, শশীর জীবন থেকেও সরে গেছে শশীর শখের গোলাপের চারাটি মাড়িয়ে দিয়ে। নিয়তি তাড়িত শশীর জীবন গ্রামেই আটকে গেছে। লেখক শশীর এই পরিণতির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—

''জোরে আর আজকাল শশী হাঁটে না, মন্থর পদে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে প্রবেশ করে। গাছপালা বাড়িঘর ডোবাপুকুর জড়াইয়া গ্রামের সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ রূপের দিকে নয়, শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ। ... তালবনে শশী কখনও যায় না। মাটির টিলাটির উপরে উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।''[২১]

ডাক্তার শশীর ব্যক্তিক পরিণতি যাইহোক না কেন, মানিক কিন্তু মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তারকেই শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। যাদবের মৃত্যুর পর শশীর হাতেই হাসপাতাল করার দায়িত্ব রেখে যাওয়ার মধ্যে তারই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু জগদীশবাবু তার ডাক্তার নিত্যপদকে এমন আলোকময় পরিণতির পথে নিয়ে যান নি।

কাহিনীতে আমরা দেখি অগ্রজ সত্যপদ'র মৃত্যুর পর নিত্যপদ তার ছেড়ে যাওয়া গ্রামেই ফিরে আসে। গ্রামের প্রকৃতিমুগ্ধ নিত্যপদ অল্পদিনেই গ্রামবাসীর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে। গ্রামের স্বার্থান্ধ মানুষের সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। গ্রামের প্রধান মতিলাল নিত্যপদর উদারতাকে সুকৌশলে বযবহার করতে থাকে। হাতুড়ে ফণী ডাক্তার ও মতিলাল মিলে যৌথভাবে নিত্যপদর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। নিজে রং মেশানো ওষুধ দিয়ে মানুষকে ঠকায় ফণী, কিন্তু নিত্যপদ মানুষের কাছে বিনা পয়সায় ওষুধ পৌঁছে দেয়। কিন্তু যাদের ওষুধের দাম দেবার সামর্থ্য নেই, তারা পর্যন্ত মতিলাল আর ফণীর প্ররোচনায় পা দেয়। গ্রামের সকল স্তরের মানুষ সম্মিলিত ভাবে ষড়যন্ত্র করে নিত্যপদ'র জীবন দুর্বিষহ করে

তোলে। এই সব অন্ধকার গলিপথের মানুষই হয়ে ওঠে নিত্যপদর নিয়তি। সেই চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ফণী ডাক্তারের কৌশলকেই সঠিক বলে মনে করেছে নিত্যপদ। সহকারী কান্তিভূষণকে সে নির্দেশ দিয়েছে—''আর ওষুধ বিতরণ করে' কাজ নাই। জল দিতে থাকো। ফণীবাবু দেশের লোকের নাড়ী ধরে আছেন—তাঁর ব্যবহারই ঠিক। আমরা ভুল পথে চলেছিলাম, ভাই।''[২২]

শশীর উত্তরণ যেভাবে ঘটেছে ফণীর মত হাতুড়ে ডাক্তারদের হারাতে না পেরে নিত্যপদ'র পরিণতি হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে। লেখক দেখিয়েছেন নিয়তি নিয়ন্ত্রিত অন্ধকার পথে চলমান মানুষগুলির কোনো উত্তরণ নেই। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তিনি কি এই উত্তরণ চান নি? তিনি কি তিমিরে আবদ্ধ থেকে তিমির হননের গান গাইতে পারেন নি কবির মত—

''তিমির হননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমির বিলাসী?
আমরা তো তিমির বিনাশী—
হ'তে চাই।
আমরা তো তিমির বিনাশী।''[২৩]

আসলে মনুষ্য ধর্মের স্তবে নিবুত্তর জগদীশবাবু নৈরাশ্য পীড়িত নিয়তি লাঞ্ছিত মানুষ এবং তাদের ট্রাজিক পরিণতিকেই উপন্যাসে তুলে এনেছিলেন।

'তাতল সৈকতে' উপন্যাসেও মানুষের মনের জটিলতায় অপরাধবোধে ভাগ্য-দোষের ভিন্ন মাত্রা পেয়ে যায়। উপন্যাসের নায়িকা শরৎ। তার জীবনের তিনটি স্তরকে লেখক চিত্রিত করেছেন। প্রথম স্তরে সে স্বচ্ছল পরিবারের গৃহবধূ। তার শ্বশুর এলাকায় সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে যেমন পরিচিত ছিলেন, তেমনি উপার্জনও করেছেন প্রচুর। দ্বিতীয় স্তরে তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হারাতে হয়েছে এবং দৈব দুর্ঘটনায় শেষ সম্বলটুকুও গেছে। তৃতীয় স্তরে শরৎ একা সহায় সম্বলহীন হয়ে নিজের দুটি ঘরের একটিতে ভাড়াটে বসিয়েছে। তার এই দুঃসময়ের একমাত্র সঙ্গী বালকপুত্র শান্ত—যাকে মানুষ করার ভাবনা শরৎকে অস্থির করে তোলে। একদিন সে ছেলের জন্যে অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস তাকে নোংরা পঙ্কে নিমজ্জিত করে। তাকে স্বৈরিণী ভেবে মনোহর দত্ত তাকে সম্ভাষণ করলে শরৎ তার মাথায় আঘাত করেছিল—

"... ত্রাসে শরতের মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতেছিল। মনোহরের প্রশ্নে প্রেতলোক অন্তর্হিত হইয়া ছায়াময় ইহলোক সহস্রবাহু রাক্ষসের মতো তার দৃষ্টির সম্মুখে সহসা নাচিয়া উঠিল— কি উদ্দেশ্যে সে চারিদিকে চাহিল তাহা সে বোধহয় নিজেই জানে না... কিন্তু চোখে পড়িয়া গেল, একটা লোহার গরাদে ... অর্ধ-চেতনা অর্ধ-অচেতনার মাঝেই সে চক্ষের নিমেষে সেটা ভুলিয়া লইয়া মনোহর দত্তের গা বরাবর বসাইয়া দিলো এক ঘা—"[২৪]

আঘাত গুরুতর না হলেও ঘটনাটা নিয়ে হইচই পড়ে যায়। শরৎ যে ব্যভিচার করেনি তার জন্যে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক নয়। তবে পুত্র শান্ত'র কাছে নিজের কলঙ্কময় জীবনের কথা ব্যক্ত হয়ে পড়বে—এই আশংকায় সে পরিচিত আশ্রয় ছেড়ে সম্পূর্ণ অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করেছে। উপন্যাসের শেষে এখানেও জনপবাদ হয়ে ওঠে শরতের নিয়তি। তার আদি গ্রামের রমা বৈষ্ণব ভিক্ষার জন্যে দরজায় এসে দাঁড়ায় এবং সে-ই মনোহরের সঙ্গে শরতের অবৈধ সম্পর্কের কথা ধনী গৃহিণী রাজনন্দিনীকে জানায়। সদলাবলে রাজনন্দিনী সেই আদিরস যুক্ত গল্প রণজিৎকে জানালে রণজিৎ সংশয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর পরিণামে আত্মহত্যা ছাড়া শরতের আর কোনো পথ খোলা থাকে না। উপন্যাসের একেবারে শেষে ভাগ্য বিড়ম্বিত সেই নারীটির করুণ পরিণতি লেখক বর্ণনা করেছেন—

"... প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে নিমু মোড়ল ... চেঁচাইতে লাগিল, কার সর্বনাশ হল রে..। কে আছো কোথায় শীগ্‌গির এসো ... কার সর্বনাশ হয়েছে দেখে যাও...

শুনিয়া লোকে ঘুম ভাঙিয়া কাপড় গামছা সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল, এবং পুকুরঘাটে অকস্মাৎ এমন কলরব উঠিল যে পাখিদের আনন্দ কাকলি বন্ধ হইয়া গেল...

ব্যাপার সামান্যই একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ জলে ভাসিতে ছিল। প্রভাতের প্রথম আলোকে উজ্জ্বল জলাশয়ে অচঞ্চল ভাসমান দেহটির দিকে চাহিয়া মাধব রায় বলিলেন— জিতুর নতুন মা।"[২৫]

মানুষের এমন অন্ধকারময় মানসিকতাই শরতের মৃত্যুকে অনিবার্য করে কাহিনীকে করুণ পরিণতি দিয়েছে।

'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের নায়ক সিদ্ধার্থ ওরফে নটবরের আত্মজিজ্ঞাসা ছিল জীবন যুদ্ধে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা কীট পতঙ্গের আছে, উদ্ভিদেরও আছে; তাহলে সে

করবে না কেন। আর এইভাবে জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকাটা বিধিদও প্রেরণা। এই প্রেরণার বশেই আমরা দেখি 'সুতিনী' উপন্যাসের নায়িকা নিজেকে বাঁচানোর প্রাণপন লড়াই করছে। একটা সময় পর্যন্ত তাদের সংসারে শান্তি ছিল। কিন্তু রাজবালা পরপর চারটি মৃত পুত্র প্রসব করায় নিয়তি সহসা তাদের সংসারে কালো মেঘ ঘণীভূত করে দেয়। মৃত সন্তান প্রসবের দায় রাজবালা স্বামীর ওপর চাপায়। বিধি বাম বলে স্বামী ভগ্ন স্বাস্থ্য আর সেকারণেই সাতবছর 'গোঙানোর' পরেও রাজবালার ভাগ্য ফেরেনি। স্বামীকে ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করে নিজেকে সুস্থ ও নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে জেদের বশে নিজের বোন মধুবালার সঙ্গে স্বামীর বিয়ে দেয়। এই বিয়েও ছিল ভবিতব্য। উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদের সূচনাতেই লেখক জানিয়েছেন—''মধুবালার বিবাহ ঐরূপই হইবে—ইহাই অখণ্ডনীয় ভবিতব্য; অদৃষ্টের লেখা, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ প্রভৃতি মণীমোহন আর কালীতারা উভয়েই তাহা মস্তক অবনত করিয়া সমস্বরে স্বীকার করিলেন।''[২৬]

কিন্তু ট্রাজেডির সূত্রপাত বিয়ের মাসখানেক পর থেকেই। মধুবালা আর তার স্বামীর সম্পর্ককে ঘিরে রাজবালার জীবনে যে চরম সংকট দেখা দেয় তা পূর্ণমাত্রা পায় মধুবালা পুত্রবতী হওয়ায়। নিজের জরায়ুকে সুস্থ প্রমাণ করার জন্যে তার নিরন্তর লড়াই চলে। আসলে দুর্গাপদ'র কাছে নিজেকে স্ত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে না পারাই তার জীবনে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। নিয়তি তাকে এই লড়াইতে পরাস্ত করেছে। নিয়তির এই ভূমিকা বিষয়ে ড. বীরেন্দ্র দত্ত যথার্থই লিখেছেন—

''সুতিনী' উপন্যাসে দুর্গাপদ'র স্ত্রী ইতিপূর্বে চারটি মৃত পুত্রের জন্মদাত্রী রাজবালার পঞ্চম সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় মৃত্যুকে এক জাতীয় আত্মহননের বা ইচ্ছা মৃত্যুর ব্যঞ্জনা দিয়ে চরিত্রের অলিখিত ভাগ্যের অভিঘাতকে রূপ দিয়েছেন। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের চরম অশান্তির পিছনেও আছে ভাগ্যের রহস্যময় ক্রিয়া।''[২৭] এই অভিমত অত্যন্ত যথার্থ।

জগদীশ গুপ্ত জীবনকে যেভাবে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখেছেন, সেভাবেই সাজিয়েছেন তাঁর সাহিত্য সংসারের মানুষগুলিকে। এই মানুষগুলি কেবল সংসারের অন্ধকার গলিপথেরই নয়, জীবনের চঞ্চল ভাগ্যক্রিয়ার শিকার হয়েই তারা উপন্যাসের পাতায় পাতায় ঘুরে বেড়িয়েছে। মানুষগুলির যাবতীয় অসহায়তার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল এক অলৌকিক অনড় শক্তি। সেই অলৌকিক শক্তির প্রভাবেই 'গতিহারা জাহ্নবী' উপন্যাসে যাবতীয় গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও

কিশোরী নিজেকে অকিঞ্চনের যোগ্য করে তুলতে পারেনি। এর জন্যে মূলতঃ দায়ী অকিঞ্চনের লাম্পট্য আর বহুনারীগামিতা। নিছক নিয়তি তাড়িত বলেই সে এমন লম্পট স্বামীর হাতে পড়েছিল, যে বিয়ের রাতেই স্ত্রীর সখিকেই লোলুপ দৃষ্টিতে দেখেছে এবং লাভ করার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করেছে। প্রচলিত সামাজিক ভাবনায় বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। সেই বন্ধনে অকিঞ্চন আর কিশোরীকে বেঁধে সম্প্রদানের পর কন্যাপক্ষীয় পুরোহিত জয়চক্র স্মৃতিতীর্থ কিশোরীকে আশীর্বাদের কথা বলেছিলেন। সেই পবিত্র মুহূর্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—

''... আপনারা মাকে আশীর্বাদ করুন'—বলিয়া অবগুণ্ঠন তুলিয়া ধরিতেই সভা থমকিয়া গিয়াছিল—এত কোলাহল চঞ্চলতা এক নিমেষে নিঃশব্দে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, এবং এত সজ্জা এত আলো এত বর্ণ এত স্পন্দন অনিন্দনীয়তা অতিক্রম করিয়া সভার সম্মুখে বিরাজ করিয়াছিল আনত আননা কন্যার সুখের সেই পেলব পুলকশ্রীটি—তাহা অনুপম। ক্ষণেকের জন্য সকলেরই মনে হইয়াছিল, এই কন্যা ভুবনমোহিনী কমলার অবিরামবাহী আশীর্বাদের যে বিত্ত মুখশ্রীতে বহন করিয়া আনিয়াছে তাহাই আমরা নতশিরে গ্রহণ করিলাম।''[২৮]

কাহিনীর সূচনাতেই এতো আলোর ব্যঞ্জনার মধ্যেই যেন কিশোরীর বিড়ম্বিত ভাগ্যের ছায়া প্রচ্ছন্ন ছিল। অন্ধকার গলিপথে যেসব কদর্য মানুষের নিয়ত আনাগোনা, অকিঞ্চন ছিল তাদের যথার্থ প্রতিনিধি। জীবনের প্রধান বেড়ে ওঠার কালেই সে অন্ধকারের দেবতার হাত ধরেছিল। ফলে পাড়ার সমবয়সীদের তুলনায় তার নৈতিক-চারিত্রিক পতন হয়েছিল ঢের বেশী। ফলে অপদার্থ অকিঞ্চনের স্ত্রী প্রবোধ-সুধীর-গণেশ-এ্যম্বক-অরুণ প্রমুখদের স্ত্রীর তুলনায় নিখুঁত হলেও অকিঞ্চনের বিকৃত তৃষ্ণা মেটেনি। চাঁদের মতো সুন্দর যার লাবণ্য অঙ্গের প্রভা মুখের শ্রী ও সুষমা তাকে ছেড়ে অকিঞ্চন শ্বশুর বাড়ীতে গিয়েও প্রথমেই খোঁজ করেছে স্ত্রীর সখীকে। 'তোমার সইকে দেখলাম না তো?' একথা শুনে বজ্রাহত কিশোরী মাকে জানায় তার অপদার্থ স্বামী যেন আজই চলে যায়। আসলে স্ত্রী কিশোরীর রূপ লাবণ্য অকিঞ্চনের ছানিপড়া চোখে ধরা পড়েনি। বরং তার চেয়ে বাগ্‌দী পাড়ার 'খারাপ' মেয়েরা তার কাছে অনেক বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। বন্ধুদের কাছে সে অনায়াসেই স্ত্রীর স্থূল দেহ সর্বস্বতার কথা বানিয়ে বানিয়ে বলতে দ্বিধা করেনি। স্বামীর এই স্থূল মানসিকতাই হয়ে ওঠে কিশোরীর নিয়তি। স্বামীর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে সে বাপের বাড়ী চলে গেছে। আর ফিরে আসে নি শ্বশুর

বাড়ীতে। কিন্তু দৈব নির্ধারিত পথেই সে দু'মাস যেতে না যেতেই গভীর বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছে যে সে মা হতে চলেছে—

''...বাহ্যত প্রশান্তভাবে দিন চলিতে চলিতে দ্বিতীয় মাসের একটি দিনে কিশোরী অনুভব করিল যে, গর্ভবতী। এ-দিক্‌টা কেউ ভাবে নাই, কিশোরীও না। তাহার এই অনুভূতিটা যে অচিন্তনীয় আর স্বতন্ত্র আকারে দেখা দিল তাহা চির স্মরণীয়, সংসারের আর কোনো নারী জঠরে সন্তান আগমনের সংবাদ ঠিক্ এমনি করিয়া গ্রহণ আর অনুভব করে নাই। সংসারে যে শুভ সংযম দেখা যায় এবং বিবাহের যে দার্শনিকতা আজ পর্য্যন্ত মানুষকে মুগ্ধ এবং পবিত্র করিয়া আসিয়াছে তার উৎপত্তি নাকি স্বামীর ঔরসে নারীর গর্ভধারণেই।''[২৯]

নিয়তি নির্যাতিত কিশোরীর ভেতরটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। নিজের কাছেই সে জানতে চায়, এই সন্তান কি স্বামীর আত্মজ, স্বামী যা অকাতরে দান করে করে ইহকাল ও পরকালব্যাপী কলুষ মর্মে আত্মায় পুঞ্জীভূত করেছিল এই সন্তান সেই অশেষ কলুষ জাত। সাপের যেমন বিষদাঁত থাকে ঐ পুরুষটির অন্তরে তেমনি একটি জ্বালাময় প্রবৃত্তি আছে—এই সন্তান সেই প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির চিহ্ন মাত্র। দৈব অনুগ্রহে প্রাপ্ত ধন এই সন্তান নয়। এর সঙ্গে অনশ্বর অমৃতের কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে তার ভেতরে মাতৃত্বের বীজ অঙ্কুরিত করে বিধাতা তাকে অমৃতের আস্বাদ এনে দেয়নি। কিশোরীর সমস্ত চাওয়া-পাওয়া নিঃশেষ হয়ে যায়। কোনো কান্তিময় আলো তার চোখের সামনে আর জ্বলে ওঠে না। সে মা হেমশশীর কাছে গিয়ে নিজেকে সমর্পণ করে—

''... আমি কি করব বল। আমার পেটে ছেলে এসেছে। তোমার পায়ের তলায় আমি পড়লাম, যা'খুশি করো তোমরা আমায় নিয়ে, আমি আর পারছি না।''[৩০] এই সমর্পণ আসলে অসহায় মানুষের নিষ্ঠুর নিয়তির কাছে অনিবার্য। কেননা যাবতীয় চিন্তার ক্ষেত্রগুলো রুদ্ধ হয়ে গিয়েই এই বিপর্যস্ত অবস্থা আসে। কিশোরীও সেই অবস্থার শিকার।

নারী গণিকা হয়ে জন্মায় না। সমাজ তার নিজের প্রয়োজনে নারীকে গণিকা করে তোলে। এই নারীকে নিয়ে পুরুষ নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। হয়ে ওঠে নারীর বিধাতা। রোমান্টিক পুরুষদের চোখে নারী মাত্রই দয়িতা বা মানস সুন্দরী, তাই তার চোখে পড়েছে শুধু নারীর চারপাশের বর্ণ, গন্ধ, ভূষণ, যাতে নারীকে সাজিয়েছে পুরুষ। পুরুষ প্রেম আর আলিঙ্গনেও ভুলতে পারে না, সে প্রভু সে বিধাতা, সে নারীর স্রষ্টা। আসলে পুরুষের অহমিকা এখানে

প্রকাশ পেয়েছে প্রকটভাবে, নারী সৃষ্টিতে সে বিধাতার সাথে নিজেদের অংশীদারত্ব দাবী করেছে। অস্বীকার করেছে নারীর বাস্তবতাকে, নারীকে বলেছে অর্ধেক মানবী, আর অর্ধেক কল্পনার। তাই পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা নারী সৃষ্টি না করলেও নারী ধারণাটি পুরোপুরি পুরুষের সৃষ্টি। পুরুষ নারীকে নানা শব্দে শনাক্ত করেছে, নারীর সংজ্ঞা রচনা করেছে। নারীর জন্যে বিধি-নিয়ম চালু করে হয়ে উঠেছে বিধাতা। আর নারী-নিজেকে বারবার সেই পুরুষের চাওয়া-পাওয়ার কাছে নিজেদের সমর্থন করেছে। কখনো গৃহের চার দেওয়ালে, কখনো গৃহের গণ্ডীর বাইরে। ঘরের বৃত্তে নারীকে পেয়ে পুরুষ তৃপ্ত হয়নি। ফলে বহির্বিশ্বে নারী তার জীবন ও যৌবন সাজিয়ে রেখেছে পুরুষের জন্যে। এইভাবে নারী গৃহী জীবন থেকে ছিটকে গিয়ে হয়ে উঠেছে গণিকা; আবার বহু পুরুষের তৃষ্ণা মিটিয়ে গৃহ বুভুক্ষা নিয়ে ঘরে আসতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হল, পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজ কাঠামোর হাল বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ধরে রাখতে সহায়তা করেছে নারীরাই। তাইতো উত্তম গৃহ-জীবনে এলে মোক্ষর মা টুকীকে মনে করিয়ে দিয়েছে উত্তম 'বেশ্যে' ছিল। বিধাতা পুরুষের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এই পুরুষের প্রতিনিধি বিশ্বম্ভর ও পরিতোষ অনায়াসেই চূর্ণ বিচূর্ণ করেছে উত্তম ও টুকীর যাবতীয় সোনালী স্বপ্নকে। এরকমই স্বভাবসিদ্ধ ইতর আর কোমর বাঁধা শয়তান পুরুষের প্রতিনিধি 'নন্দ আর কৃষ্ণা' উপন্যাসের মণীন্দ্রবাবু। যার গৃহের গণ্ডীর ভেতরে কৃষ্ণা'র মতো গণিকা আবদ্ধ থেকে পুরুষকে নিয়ে আদিম খেলায় মেতে উঠেছে বারবার। এই কৃষ্ণা যেন নারীর বিষাক্ত রূপের প্রতিমূর্তি যার মধ্যে নির্মল স্নিগ্ধ নারী সত্তা নেই, নেই গৃহ বুভুক্ষা। পুরুষকে নিয়ে লীলা খেলাতেই যার আদিম আনন্দ। সে পুরুষ বিধাতার অযত্নের ফলে সৃষ্ট এক বিকৃত রূপ। ছেলের গৃহ শিক্ষক নন্দর কাছে কৃষ্ণার পরিচয় পরিস্ফুট করতে গিয়ে সেই বিকৃত কাম পুরুষ মণীন্দ্র জানিয়েছেন—

■ ''তুমি হয়তো ভাব্ছো আমার সন্দেহটাই আছে, তাই টোকা মেরে একটু পরীক্ষে করছি; কিংবা সবই আমার মিথ্যে কথা আর আমি খুব নির্লজ্জ। তবে শোনো এক মজার কথা; প্রথমেই জানাই যে, উনি আমার স্ত্রী নন্।''[৩১]

■ ''... আমার বয়স চল্লিশ, তোমার বয়স তেইশ, আর, তুমি পালিয়েছ বলে। আমি কিন্তু ধরে নিলাম, আমার স্ত্রীর উৎপাতেই পালিয়েছিলে। কাজেই তুমি আমার পরম বিশ্বাসভাজন, তোমার শুভ আমি একান্তভাবেই চাই। তারপর শোনো, উনি আমার স্ত্রী নন্।

তবে কে? নিশ্চয়ই তা জান্‌তে তোমার কৌতূহল হয়েছে। উনি আমার খুড়তুতো ভগিনী।"[৩২]

■ "... আমি সম্পর্কে সে-ই খুড়ীর বাড়ীতে যেতাম; এবং তারপর সেই মেয়েটি বড় হ'লে, আর আমার স্ত্রী বিয়োগ হ'লে, যাক্, অত খুঁটি নাটিতে কাজ নেই। আশ্চর্য্য সুন্দরী; আমি লোভ সংবরণ করিতে পারিনি, তুমি পেরেছ। ধন্যি ছেলে বটে তুমি। তোমার এখন যৌবনের পুরো জোয়ার আর রূপ আছে, আমি প্রৌঢ়।"[৩৩]

মণীন্দ্রর এই আত্ম-উদ্‌ঘাটন থেকেই পরিস্কার যে, সম্পর্কের তোয়াক্কা না করে সে কৃষ্ণার বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে এবং স্ত্রী বিয়োগের পরেই তাকে নিজের বাড়ীতে এনে রক্ষিতার মতোই রেখেছে। মণীন্দ্রর নোংরা হাতেই নির্ণীত হয়ে গেছে কৃষ্ণার ভাগ্য। কৃষ্ণার অন্তরে যে সুস্থ সুন্দর নারীসত্তা ছিল তাকে হয়তো অঙ্কুরেই বিনাশ করেছে মণীন্দ্র। ফলে পুরুষ বিধাতার বিকৃত মূর্তি কৃষ্ণা রূপ যৌবনের আগুনে পুরুষ পেলেই পুড়িয়েছে। তরতাজা তরুণ নন্দকেও সে তার পাতা ফাঁদে ফেলেছিল। সেই আগুনের শিখার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—"প্রভুপত্নী তরুণী রমণীমাত্র একখানি তোয়ালে কটিদেশ হইতে বিলম্বিত করিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—দীর্ঘ কেশদামে পৃষ্ঠদেশ আবৃত ধৌত চুলে চিরুণী লাগাইয়া তিনি হাত তুলিয়া চিরুণী টানিয়া আনিতেছেন পিছনের চুলের ভিতর—দাঁড়াইয়া আছেন দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া, এবং সুবৃহৎ দর্পণের পটভূমিকায় তার সর্ব্বাঙ্গের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।"[৩৪]

এই রূপবহ্নি তেইশ বছরের তরুণ নন্দর বুকের ভেতরে উথাল পাতাল ঝড় তুলে দিয়েছিল। সে ভয়ে পালিয়ে গেছিল। পরে ফিরে এলে কৃষ্ণার কাছে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান শুনতে পেয়েছে। সে যেন না পালায়। আয়নায় সে কৃষ্ণাকে যেমন দেখেছে ওরকম আবার দেখুক—এটাই কৃষ্ণার কাম্য। মণীন্দ্র যে বিকৃতকাম কৃষ্ণার জন্মদাতা, সেই নারী আবার নিজের পোড়া ভাগ্যের দহন জ্বালায় নন্দকে দগ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছে। অন্ধকার গলিপথের হাতছানি নন্দকে সম্পূর্ণ নষ্ট হতে দেয়নি তার স্ত্রী মমতার স্নিগ্ধ ভালোবাসা। তবু সেই ভালোবাসার মুক্ত শুদ্ধ বাতাস নিয়েও নন্দ-যখন কৃষ্ণার রূপ বহ্নিতে পিপিলিকার মতো দগ্ধ হতে গেছে তখনই কৃষ্ণার মায়ের সতর্কবার্তা তার অবচেতন মনের দরজাকে মুক্ত হতে দেয়নি—"তোমাকে বল্‌ব কি বাবা, মেয়েটা চিরকাল শয়তান। ... রূপ আছে, রূপের জোরে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে মজা দেখা ওর মজ্জাগত অভ্যাস। ... তোমাকে মণির বাড়িতে দেখে আমার তৎক্ষণাৎ

মনে হল, আর, ভারি ভয় হল যে, এই ভালো ছেলেটাকে বজ্জাত মেয়ে আমার কষ্ট না দিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না।"[৩৫]

কথাগুলো নন্দ'র জীবনে দৈব বাণীর মতোই বর্ষিত হয়েছে। মানুষ নিয়তির হাতের ক্রীড়নক, একথা সত্য। 'আবার সেই নিয়তিই' মানুষকে বিপথে চালিত হবার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। নন্দ তাই বিপথগামী হতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। কৃষ্ণার মায়ের কাছে সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে। এবং নিজেকে শৃঙ্খলমুক্ত মনে করেছে। আর তার কাছে সত্য হয়ে উঠেছে স্ত্রী মমতার স্নিগ্ধ সুখখানি—"... তখন তার প্রাণে একমাত্র সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাহারই মমতা; মমতার মুখচ্ছবি অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া আছে, তার কণ্ঠ জিহ্বা হৃদয় ব্যাপিয়া নিঃশব্দে ধ্বনিত হইতেছে মমতারই স্নিগ্ধ নামটি।"[৩৬]

মৃত্যু হল জীবনের অনিবার্য পরিণাম। জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গত লিখেছিলেন—

"কখন মরণ আসে কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড়
কমলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে—গাঙচিল শালিখের প্রাণ
জানি নাকো—"[৩৭]

এই নির্মম সত্য কি আর সহজে ইন্দ্রনাথের মতো বলতে পারা যায়—মরতে একদিন হবেই তো। বিশেষ করে প্রিয়তম সন্তানের অকাল প্রয়াণ কতটা মর্মান্তিক হয়ে জন্মদাতা-জন্মদাত্রীর বুকে আঘাত করে, সেকথা বর্ণনাতীত। জগদীশবাবু এরকমই এক মর্মান্তিক ভাগ্য বিপর্যয়ের চিত্র অংকন করেছেন তাঁর 'রতি ও বিরতি' উপন্যাসে। এখানে নায়ক রামের জীবন সংগ্রামের এক করুণ চিত্র অংকন করতে গিয়ে লেখক দেখিয়েছেন জীবনের অন্ধকার গলিপথটা কতখানি অনিশ্চিত হতে পারে আর সেই পথে চলতে গিয়ে কীভাবে মৃত্যু নিয়তির স্বরূপকে প্রকট করে দেয়। উপন্যাসের রাম ভিক্ষোপজীবী, হতদরিদ্র। 'রোমন্থন' উপন্যাসের হতদরিদ্র অভয়ের তবু জীবন-জীবিকার ভার বহনের জন্য একফালি জমি ছিল, যাতে সে পাট চাষ করেছিল। কিন্তু এই উপন্যাসের রামের সেই সম্বলটুকুও নেই। সে একক মানুষ। জীবনের শেষ পর্যায়ে নিয়তির নিষ্ঠুরতায় প্রথম কবে সে ভিক্ষাপাত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, আজ আর তা মনে নেই। তার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক উপন্যাসের একেবারে প্রথম পরিচ্ছেদেই লিখেছেন—

"রামের জীবনকথা অতি ক্ষুদ্র—তার নিজেরও সব কথা মনে নাই মনে রাখিবার সময়ও নাই, কিন্তু সকল দিনের চাইতে উজ্জ্বল একটি দিন উর্দ্ধের ঐ বিরাটায়তন সস্মিত আকাশের মতো

তাহার মনশ্চক্ষুর পুরোভাগে অক্ষয় চিরস্থির আর উদ্ভাসিত হইয়া আছে। সাগর মন্থন করিবার সময় যে দিনটাতে অমৃত পাওয়া গিয়াছিল আর লক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন তেমন স্মরণীয় দিনটি।"[৩৮] অতিসংক্ষিপ্ত, প্রায় তুচ্ছ রামের জীবনের সেই পুণ্যলগ্নে তার স্ত্রী ছিল, লব নামে একটি পুত্রও ছিল। পুরাণের রামচন্দ্রের মতো ঐশ্বর্যে না হলেও খেটে খাওয়া রামের জীবনে পুত্র লবের অবস্থান রামচন্দ্রের মতোই কোনো অংশে কম ছিল না। সেই আদরের ধন লবকে ঘরের মেঝেতেই গর্তে বসবাসকারী একটি সাপ দংশন করে এবং পিতা-মাতার বুক খালি হয়ে যায়। সন্তানকে হারিয়ে রাম সেই কালসর্পের গর্তটার দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এই মৃত্যু যেন পরিকল্পিত। সেই বিধাতা নির্দেশিত ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—

''একদিন গভীর রাত্রে ভগবান তাহাকে আদেশ করিলেন, 'সাপ তুমি রামের ছেলে লবকে দংশন করিয়া আইস, তাহার আয়ু শেষ হইয়াছে'।

এই আদেশে পাতালপুরীর অন্ধকারে নিদ্রিত সর্পের কুণ্ডলীকৃত অলস দেহের আদ্যোপান্তে চেতনা তরঙ্গিত হইল—কুণ্ডলী খুলিয়া খুলিয়া দেহ ধীরে ধীরে সচল হইয়া উঠিল তাহার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে তাহার সম্মুখের মাটি ঝরিয়া ঝরিয়া অবাধ সরল একটি পথ প্রস্তুত হইল—সর্ব্বাগ্রে তার স-দন্ত মাথাটা বিবরের বাহিরে আসিল—যেখানে লবকে লইয়া তাহারা নিদ্রিত ছিল সেই দিকে তার মুখ ফিরিল—ধীরে ধীরে সমগ্র মসৃণ দেহটা অতি নিঃশব্দে নির্গত হইল।"[৩৯]

একেবারেই বিধাতার পূর্ব-পরিকল্পিত এই মৃত্যুর আয়োজন। অসহায় মানুষের এখানে কিছুই করণীয় নেই। যে গর্ত থেকে 'ভগবানের' দূত এসে লবকে নিয়ে চলে গেছে, সেই গর্তটি রাম বুজায় নি, বুজাতে দেয়নি। বরং অনেক আশা নিয়ে তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে সেই গর্তের ধারে মাথা রেখে প্রতিদিন ঘুমায়। রাত্রির সুদীর্ঘ কালো অন্ধকার আর অনেক নিদ্রার সুযোগ শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সেই কালসর্পকে আর ওই পথে তারা দেখতে পায় না। লখীন্দরের মৃতদেহ যেমন একদিন ভেলায় ভাসতে ভাসতে বেঁচে উঠেছিল দেবতার স্পর্শলাভে তেমনি করে তার পুত্রও বেঁচে উঠবে—এমন অলীক আশা নিয়ে একদিন জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে সন্তান হারা অসহায় গয়ামণি। শুরু হয় রামের একক পথচলা। নিয়তি যেন তাকে নিয়ে খেলা করতে থাকে। ভিক্ষাপোজীবী রামের শরীর ও মন ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকে। এবং সে অদৃষ্টের ভূমিকায় পরিপূর্ণ ভিখারী হয়ে ওঠে। এই ভিক্ষুক জীবনে রামের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি

নীলকণ্ঠ মজুমদারের নাতির অন্নপ্রাশনে গিয়ে রায় বাহাদুরের কাছ থেকে একটি টাকা। প্রায় অনাহারে থেকে গাঙ্গুলীর হোটেলের উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়ে রাম বেঁচে ছিল। রাজা বাহাদুরের কাছে টাকাটি পেয়ে রামের ভাবনার জগতে ঝড় ওঠে। টাকাটি সে খরচ করে না। সেই টাকা আর প্রাপ্ত কয়েকটি লুচি পুঁটলী বেঁধে ঘরে পেরেকের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে। এতেই যেন তার ক্ষুধা মিটে যায়। টাকাটি নিয়ে সে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। লেখক প্রসঙ্গও জানিয়েছেন—

''টাকাটা বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনীর মাঝে ধরিয়া রাম তাহাকে স্নেহ ও সম্ভ্রমের সহিত একবার কপালে ছুঁয়াইল; তারপর তাহাকে মুষ্টির ভেতর আবদ্ধ করিয়া মুষ্টি খুলিয়া দেখিল, টাকা একটিই আছে, দ্বিগুণ হয় নাই। ... কি মনে করিয়া সে পরম লালসার সঙ্গে জিহ্বা বাহির করিয়া টাকাটার এপিঠ ওপিঠ দু'বার চাটিল।''[৪০]

টাকাটি দিয়েই তার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখার পথেও নিয়তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। পেরেকে টাঙানো ভিক্ষার ঝুলিটি মাটিতে পড়ে গেলে তাতে রাখা টাকাটি হারিয়ে যায়। রাম সারারাত ঘরের মেঝে খুঁড়ে চলে। সেই টাকাটি পেতেই হবে। কিন্তু সেটি আর পাওয়া গেল না। পরিবর্তে সুড়ঙ্গের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে লবের ঘাতক সেই কালসাপটি। প্রবল প্রতিহিংসায় অথবা আত্মহননের সুতীব্র ইচ্ছায় সে সাপটিকে আঘাত করে। সাপটিও প্রত্যাঘাত ফিরিয়ে দিলে রামের মস্তিষ্কে সর্বাঙ্গে দংশন জ্বালা অনুভূত হতে থাকে। নিয়তির হাতে অসহায়ভাবে পরাজিত হলেও বাইরে তার কোনো প্রকাশ ছিল না রামের। এইভাবে অন্ধকার গলিপথেই একটি অখ্যাত পরিবারের অধ্যায়টুকু নীরবেই শেষ হয়ে যায়। ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় এই নিয়তির লাঞ্ছনার কাহিনী সম্পর্কে যথার্থ লিখেছেন—

''নিয়তির ভূমিকা এই গল্পে মুখ্য। নির্মম নিয়তি এই গল্পে রামকে নিয়ে যেন এক মর্মান্তিক খেলায় মেতেছে। লবের মৃত্যুর পর রাম সস্ত্রীক মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছে কিন্তু কালসর্প তখন অদৃশ্য। গয়ামণি অসহনীয় যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করেছে, তখনও নিষ্ঠুর নিয়তির খেলা শেষ হয়নি, অবশেষে যখন রাম দারিদ্র্যের সর্ব্বোচ্চ বেদনায় পৌঁছে গেছে, তখনই নির্মম ভবিতব্য তার খেয়াল খুশীর খেলা সমাপ্ত করেছে।''[৪১]

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক হলেও কল্লোলীয়দের পথে তিনি হাঁটেন নি। তাঁর গল্প উপন্যাসে এই যে নিয়তির লাঞ্ছনা তা কেবল নৈরাশ্যের চিত্রাঙ্গনেই শেষ হয়নি, বরং তিনি বিষয়টিকে বিপরীত অবস্থান থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। 'অসাধু সিদ্ধার্থে'র নটবর থেকে শুরু করে,

লঘুগুরুর উত্তম-টুকী, হয়ে সুতিনী'র রাজবালা 'মহিষী'র কিশোরী কিংবা 'রতি ও বিরতি'র রাম এইসব অন্ধকার গলিপথের মানুষের জীবনকে একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দ্বারা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন অত্যন্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে। আসলে মানব ভাগ্য মানুষের কর্মফলকে দেখাতে চায়। ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবেশের দায় হল সেই কর্মফলের যথার্থ প্রতিফলন। জীবনের সমস্ত শক্তির একটা সীমা আছে যাতে কর্মফল সবসময়ই আংশিকতা দোষে দুষ্ট। জগদীশবাবু সেই আংশিকতা থেকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে গেছেন তাঁর রচনার পাঠকদের। তাই আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রান্তিটুকু কাটিয়ে উঠলে তাঁর শিল্পী প্রতিভার অখণ্ডতাকে অনুভব করা যায়। বিশেষ করে তাঁর এইসব অন্ধকার গলিপথের মানুষের জীবনে নিয়তি যে কিরূপ ভূমিকা পালন করেছে সেটা তিনি নির্মহ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষই শুধু করেননি, পাঠককেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এখানেই তাঁর শিল্পী প্রতিভার অনন্যতা। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়ন করে সমালোচক ড. সুকুমার সেন লিখেছেন—

''অসহায় মানুষের জীবন চক্র ঘুরিতেছে নির্মম নিষ্ঠুর হিংস্র অদৃষ্টের হাতে ইহাই জগদীশচন্দ্রের গল্পের অমোঘ নির্দেশ। মানুষের দৈন্য কুশ্রীতা-নোংরামির জন্য জগদীশচন্দ্র সমসাময়িক 'আধুনিক' লেখকদের মতো সমাজের বা ব্যক্তির ঔদাসীন্য, ঘৃণা বা লুব্ধতা দায়ী বলিয়া দেখান নাই। ... শক্তিশালী এবং অসাধারণ লেখক বলিয়াই জগদীশচন্দ্র আধুনিক সাহিত্যকদের মধ্যে শাখাপতিও হইতে পারেন নাই।''[৪২]

**তথ্যসূত্র :**

১. ১৯৪৬-৪৭, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ১৩৯।

২. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ৬৩৩।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৪।

৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পুতুলনাচের ইতিকথা, প্রকাশভবন, কলকাতা, পৃ. ২১৪।

৫. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৩৫।

৬. জগদীশ গুপ্তর গল্প, সুবীর রায় চৌধুরী (সম্পাদিত), দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ,

১৯৯১, পৃ. ৫৩।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

১০. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ. ১৩৮।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

১২. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ২৩১।

১৩. বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশ গুপ্ত, বিশ্ববাণী, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১৫৩।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

১৬. জগদীশ গুপ্ত : মানব ভাগ্যের এক নিঃসঙ্গ নিরাসক্ত কথাকার; জগদীশগুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য, ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ৫২।

১৭. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ২০২।

১৮. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ. ২১৪।

১৯. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯৯।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

২১. পুতুলনাচের ইতিকথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশভবন, কলকাতা, পৃ. ২১৪।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

২৩. জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, পৃ. ১০৭।

২৪. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ২৭৬।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

২৮. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ৩৭।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

৩৭. জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৩১৭।

৩৮. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ. ৫৫।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

৪২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ৩৫১।